দেশ গড়ার ডাক

অধ্যাপক গোলাম আযম

দেশ গড়ার ডাক

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক ইউসুফ আলী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল ঃ
নভেম্বর ১৯৯৩
জমাদিউস সানি ১৪১৪
অগ্রহায়ণ ১৪০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আশা কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/ক ওয়ারলেস রেল গেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ
নিউজ- পাঁচ টাকা মাত্র
সাদা- আট টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফেন্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

১৯৯২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৯৩–এর ১৫ই জুলাই পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে আমার প্রিয় জন্মভূমির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করা ছাড়া আর কোন দায়িত্ব ছিল না। জেলখানার বাইরে কখনো এক সাথে এতটা সময় চিন্তা–ভাবনা করার জন্য হাতে পাওয়া যায় না। এ দুর্লভ অবকাশে লেখা পড়ারও প্রচুর সুযোগ পাওয়া গেল।

কিভাবে এ দেশকে গড়ে তোলা যায় এ বিষয়ে আমার চিন্তার নগণ্য ফসলটুকু দেশবাসীর নিকট পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে "দেশ গড়ার ডাক" শিরোনামে এ লেখাটি রচনা করি।

কারাগার থেকে মুক্তির পর ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে দৈনিক সংগ্রামের উপ–সম্পাদকীয় কলামে ৪ কিস্তিতে লেখাটি প্রকাশিত হয়। এখন তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলো। এ পুস্তিকায় দেশ গড়ার ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানানো হয়েছে। দেশ গড়ায় সকল মহলেরই অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার দায়িত্ব রয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব সবচাইতে বেশী। তাই এ পুস্তিকায় তাদের প্রতি আবেদনটি শামিল করা প্রয়োজন বোধ করেছি।

মূল রচনায় আরও ১৩টি মহলের প্রতি তাদের উপযোগী ভূমিকা পালনের জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সে সব এ সংগে প্রকাশ করা গেলনা। আশা করি যথাসময়ে বিভিন্নভাবে আমার ঐসব আবেদনও সংশ্লিষ্ট মহলে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে। তবে এখানে ঐ ১৩টি মহলের উল্লেখ করছি যাতে এ ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তারা পুস্তিকাটি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করা প্রয়োজনবোধ করেন ঃ

১। ওলামা ও মাশায়েখগণ ২। ছাত্র সমাজ ৩। মহিলা মহল ৪। অমুসলিম নাগরিকগণ ৫। শ্রমজীবী মহল ৬। শিক্ষক সমাজ ৭। আইনজীবীগণ ৮। সাংবাদিক মহল ৯। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ১০। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীগণ ১১। বামপন্থী বলে অভিহিত মহল ১২। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী মহল ১৩। মুসলিম জনগণ।

গোলাম আযম
মগবাজার, ঢাকা
নভেম্বর, ১৯৯৩

www.pathagar.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। দেশ গড়া শুরু হয়নি	৫
২। দেশ গড়ার উদ্দেশ্য	৫
৩। দেশ গড়ার উপাদান	৬
৪। সৎ লোক	৬
৫। আসল অভাব সৎ লোকের	৮
৬। সৎ নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে?	৯
৭। সততা পলিসী মাত্র, সৎ গুণ নয়	১০
৮। সৎ লোক তৈরীর উদাহরণ	১১
৯। খাঁটি সৎ লোক তৈরীর একমাত্র পদ্ধতি	১১
১০। সৎ লোকের শাসনের গুরুত্ব	১৩
১১। দেশ গড়ার দ্বিতীয় উপাদান	১৪
১২। আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি	১৬
১৩। বাংলাদেশের আদর্শ কী?	১৭
১৪। জাতীয় আদর্শ শিশুর খেলনা নয়	১৮
১৫। ইসলামই বাংলাদেশের আদর্শ	১৯
১৬। বাংলাদেশে রাজনীতির ধরণ	২১
১৭। রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আকুল আবেদন	২৩
১৮। দেশ গড়ার কাজ	২৫
১৯। দেশ গড়ার কর্মসূচী	২৭

www.pathagar.com

দেশ গড়ার ডাক

দেশ গড়া শুরু হয়নি

আপন দেশ সবারই প্রিয়। দেশ গড়তে হবে এ দাবীও সবার। কারণ নিজেদের কল্যাণ এবং পরবর্তী বংশধরদের সুন্দর ও সুখী ভবিষ্যৎ দেশের উন্নতি ও প্রগতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এর অভাব হলে ব্যক্তিগত ও পরিবারগত উন্নতি একেবারেই অর্থহীন। বর্তমানে আমাদের দেশে নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে দূরবস্থা বিরাজ করছে তাতে কেউ শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ করতে পারছে না। জ্ঞানীর পান্ডিত্য ও ধনীর বিত্ত সত্ত্বেও তারা সবাই যেন অসহায়।

মনে প্রশ্ন জাগে, দেশ গড়ার কাজ কি তাহলে হচ্ছে না? বৃটিশের গোলামী যুগের কথা মনে থাকার মতো যাদের বয়স, তারা আমার সাথে একমত হবেন যে, আইন-শৃংখলা, নিরাপত্তা, মনুষ্যত্ব, শিক্ষার মান, যুব চরিত্র, ভেজালমুক্ত খাদ্যদ্রব্য, আইনের শাসন, সমাজ বন্ধন, পারিবারিক শৃংখলা, তরুণ ও যুব মহলে আদব কায়দা ইত্যাদির দিক দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর পর পাকিস্তান আমলে আমাদের অবনতি হয়েছে। তেমনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পর ঐসব বিষয়ে আমাদের আরও অবনতি হয়েছে। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ১৯৪৭ সাল থেকে দালান কোঠা, শিল্প-কারখানা, নগর সম্প্রসারণ এবং দেশবাসীর ক্ষুদ্র এক অংশের বিত্তশালী হওয়া ছাড়া দেশ গড়ার কাজ তেমন কিছুই হয়নি।

দেশ গড়ার উদ্দেশ্য

রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষ একমত। জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা ও মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানই দেশ গড়ার উদ্দেশ্য। এক কথায় এমন ব্যবস্থা কায়েম করা যেখানে মানুষ একথা অনুভব করবে যে, তার উপর জুলুম করা হচ্ছে না। স্বাভাবিক সুখ-দুঃখ দুনিয়ায় এক সাথেই আছে। এতে মানুষ ক্ষুব্ধ হয় না। কিন্তু অন্যায় ও অবিচার হলেই মানুষ অশান্তি বোধ করে। দুনিয়ার জীবনে নিম্নতম সুখ শান্তি পেলেই জনগণ সাধারণত সন্তুষ্ট থাকে।

www.pathagar.com

এতটুকু শান্তির সমাজ কায়েম করাই দেশ গড়ার উদ্দেশ্য। বস্তুগত উন্নতি ও ধনী দেশের মানুষের মতো ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সমাজে অশান্তি ব্যাপক আকারে থাকতে পারে। শান্তির উপাদান না থাকলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধিও অশান্তির কারণ হতে পারে। তাই দেশ গড়ার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। সুখ–শান্তিই আসল উদ্দেশ্য।

দেশ গড়ার উপাদান

দেশ গড়ার জন্য যত কিছু দরকার এর বিরাট তালিকা প্রণয়ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রধান প্রধান যে কয়টি উপাদান থাকলে অন্যান্য উপাদান যোগাড় করা সহজ হয় শুধু সে বিষয়ে আলোচনা করাই এখানে যথেষ্ট।

আসলে দেশ গড়ার প্রধান উপাদান মাত্র দুটো ঃ

১। একদল সৎ লোক, যারা জনগণকে ভালবেসে তাদের কল্যাণে কাজ করার উপযোগী গুণের অধিকারী।

২। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলার উপযোগী এমন বিধি–বিধান, যার উপর জনগণ আস্থা স্থাপন করতে পারে।

এ দুটো উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মানব জাতির ইতিহাস, এ শতাব্দীর কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্থান ও পতনের কারণ এবং বিগত ৫০ বছরে আমাদের দেশে যা কিছু দেখেছি এর অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, সৎ লোকের শাসন (Rule by Honest people) এবং সঠিক আর্থ–সামাজিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই (Correct Socio-Econo-Political System) দেশ গড়ার প্রধান উপাদান।

সৎ লোক

দেশ গড়া ও পরিচালনার দায়িত্ব যারা পালন করেন তাদের সৎ হবার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অথচ সারা দুনিয়ায় সৎ লোকেরই সবচাইতে বেশী অভাব। এর কারণ এটাই যে, সৎ লোক তৈরীর তেমন কোন পরিকল্পনা নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং আরও বিবিধ ট্রেনিং–এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যোগ্যতা সৃষ্টির সুবন্দোবস্ত করা হয় সব দেশেই। কিন্তু সৎ লোক তৈরীর কোন কর্মসূচীর কথা কোথাও শোনা যায় না।

www.pathagar.com

এ বিষয়টা ভালভাবে বুঝবার জন্য সৎ লোকের সংজ্ঞা আলোচনা করা জরুরী। সৎ লোকের সহজ ও সঠিক পরিচয় হলো, যে বিবেকের বিরুদ্ধে চলে না। সব মানুষের মধ্যে বিবেক রয়েছে বলে কেউ একে অস্বীকার করে না। কিন্তু বিবেকের কথা মেনে চলার লোক ক'জন?

কুরআনের পরিভাষায় যাকে রূহ বলা হয়েছে তাই বিবেক। এটাই মানুষের আসল সত্তা। এটা মানুষের নৈতিক সত্তা। ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যণ, সঠিক ও বেঠিক, ন্যায় ও অন্যায় ইত্যাদির পার্থক্যবোধই হলো বিবেক। এ নৈতিকতাবোধই মনুষত্ব এবং এরই কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।

মানুষের দেহ আসল মানুষ নয়। মানবদেহ ও পশু-পক্ষীর দেহ একই রকম উপাদানে গঠিত। তাই পশু পক্ষীর গোশ্ত আমাদের দেহের পুষ্টির উপযোগী। পশুর মতোই মানব দেহেরও ভাল মন্দের বিচারবোধ নেই। আপনার আদরের গাভীটি আপনার প্রিয় সাজানো বাগানের গাছ খাওয়া অন্যায় বলে বুঝবার যোগ্যতা রাখে না। মানব দেহও তেমনি পশু মাত্র।

মানবদেহ বস্তু জগতের উপাদানেই সৃষ্ট বলে সে বস্তুজগতের ভোগ করার মতো সবই পেতে চায়। দেহের দাবী অফুরন্ত। দেহের সকল দাবীকে কুরআনের পরিভাষায় নাফস বলা হয়। নাফসের নৈতিক চেতনা নেই বলে সে শুধু ভোগ করার দিকেই ধাবিত হয়। বিবেক আপত্তি জানায়। এ আপত্তি উপেক্ষা করে দেহ যদি নৈতিকতা বিরোধী কাজ করেই ফেলে তারপরও বিবেকের দংশন টের পাওয়া যায়।

সৎ লোক তাকেই বলে যে নাফসকে দমন করতে সক্ষম এবং দেহকে নৈতিক বিধান মেনে চলতে বাধ্য করার যোগ্যতা রাখে। যে কাজ বিবেক সম্মত সে কাজই সে করে। যা বিবেকের নিকট আপত্তিজনক তা থেকে সে দেহকে বিরত রাখে।

কোন সমাজে যদি এ ধরনের লোকের হাতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকে তবেই জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত ছোট বড় সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই এ কথা সত্য। তাই এ কথাও সত্য যে আজ যে অশান্তি ও বিশৃংখলা আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে রেখেছে এর জন্য অসৎ নেতৃত্বই প্রধানত দায়ী।

www.pathagar.com

আসল অভাব সৎ লোকের

দেশের সরকার এবং যাবতীয় সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় কোন অশিক্ষিত লোক নেই। সর্বত্রই যে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে তা ডিগ্রীধারীদেরই অবদান। তারা শিক্ষিত না হলে এ দুর্নীতি করার সুযোগই পেত না।

সততা ছাড়া যোগ্যতা শুধু অকল্যাণই করে। যোগ্য লোক অসৎ হলে যোগ্যতার সাথেই অসততা করে থাকে। দুর্নীতি দমনের জন্য যাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে তারা যদি সৎ না হয় তাহলে দুর্নীতি দমনের প্রতিটি নতুন বিধান দুর্নীতি বৃদ্ধিই করে। সীমান্তে চোরাচালান রোধ করার জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তারা সবাই সৎ হলে চোরাচালান কবেই বন্ধ হয়ে যেতো।

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুষের হার বেড়ে গেল। ঘুষ গ্রহণকারীদের যুক্তি হলো মার্শাল ল' হওয়ায় আগের চেয়ে ঝুঁকি বেশী। যারা ঘুষ দেয় তাদেরকেও সৎ বলা চলে না। অবশ্যই অনেকেই দায়ে ঠেকে ঘুষ দেয়।

এদেশে প্রতিভা, মেধা, যোগ্যতা ইত্যাদির অভাব নেই। আসল অভাব সততার। আর সততা এমন বুনিয়াদী গুণ যার অভাবে আর সব যোগ্যতা আপদে পরিণত হয়। প্রতিভা ও মেধা দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিয়োগ করা হলে গত ৪৫ বছরে দেশ গড়ার কাজ অনেক এগিয়ে যেতো। সততার অভাবে গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার কাজই বেশী হয়েছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রতিভা নিয়োজিত হলে সবারই মঙ্গল হয়। সততার অভাব হলে ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য পায়। এর ফলে দেশের অকল্যাণ হলে এর পরিণাম তারাও ভোগ করে যাদের অসততার কারণে এ দশার সৃষ্টি হয়।

সারা বিশ্ব আমাদের দেশকে গরীব দেশ বলছে। আমরাও এ উপাধি গ্রহণ করতে লজ্জা পাই না। কিন্তু সত্যিই কি আমরা এত গরীব? আমার বিবেচনায় আমরা সততার দিক দিয়েই সবচাইতে গরীব এবং সততার অভাবেই আর সবদিক দিয়ে গরীব হয়ে আছি। দেশে সৎ নেতৃত্ব থাকলে জনগণের মধ্যেও সততা বৃদ্ধি পেতো। উচ্চ পদস্থরা সৎ হলে নিম্ন কর্মচারীরা অসৎ হবার সুযোগ

www.pathagar.com

নিতে পারে না। সততা ও অসততা নীচের দিক থেকে শুরু হয় না, উপর থেকেই নাযিল হয়।

নীতির রাজা রাজনীতি। রাজনৈতিক নেতৃত্বই সব নীতির উৎস। দুর্নীতি এখান থেকেই সর্বত্র বিলি হয়। সৎ লোকের হাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকলে দুর্নীতি ক্রমে খতম হতে বাধ্য। দুর্নীতির দরুন আমাদের প্রতিভা ও যোগ্যতা দেশ গড়ার কাজে লাগছে না।

সৎ নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে?

সৎ লোক আসমান থেকে রেডিমেড নাযিল হয় না। এটা বিদেশ থেকে আমদানিযোগ্য কোন পণ্যও নয়। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যেমন এমনিতেই তৈরী হয় না, সৎ লোকও বিনা পরিকল্পনায় তৈরী হতে পারে না।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কিছুই শিক্ষা দেয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রেই কর্মরতদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু চরিত্র গঠন ও নৈতিক উন্নয়নের কোন কর্মসূচী কোথাও আছে বলে জানা যায় না। এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। অথচ জ্ঞান ও যোগ্যতা সততার সাথে ব্যবহার না করলে অভিষ্ট সুফল কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেকেই যাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য যথারীতি পালন করে এর জন্য একমাত্র 'ডিসিপ্লিনের' উপর নির্ভর করা হচ্ছে। কাজে ফাঁকি দেয়া, অবৈধ পথে আয় করা, ক্ষমতার অপব্যবহার করা, ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি যত রকম দুর্নীতি হতে পারে তা কি শুধু আইন ও ডিসিপ্লিনের বিধান দ্বারা রোধ করা সম্ভব?

আইন প্রয়োগকারী যদি অসৎ হয় তাহলে আইন অকেজো হয়ে পড়ে। অসৎ কর্মকর্তার হাতে ডিসিপ্লিন অচল। অসৎ দারোগা ডাকাতের সহযোগী। এদেরকে দমন করবে কে? তাই এমন লোক তৈরী করতে হবে যারা বিবেকের তাকিদে চলে, যারা নাফসের গোলাম নয় ও যারা ব্যক্তি স্বার্থে নিয়ম লংঘন করে না। যাদের সততার উপর নির্ভর করা যায় এমন লোকদের হাতে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব না থাকলে আইন ও ডিসিপ্লিনের কোন মূল্য নেই।

www.pathagar.com

সততা পলিসী মাত্র, সৎ গুণ নয়

সততার মোটামুটি একটা মান অর্জন করা ছাড়া কোন দেশই উন্নতি করতে পারে না। তাই সব কালে সব দেশে, সব জাতিই সততার গুরুত্ব স্বীকার করে। জনগণের মধ্যে সততা সৃষ্টি হোক–এটা সবাই চায়। কিন্তু সততা সৃষ্টির সঠিক পদ্ধতি না জানার ফলে পার্থিব উন্নতির প্রয়োজনে সততাকে পলিসি বা কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। "Honesty is the best policy" একটি বিশ্বখ্যাত প্রবচন। ব্যবসায় সৎ বলে সুনাম হলে উন্নতি হবে। তাই উন্নতির কৌশল হিসেবে সততার প্রদর্শনী করা হয়। যদি এমনভাবে অসততা করা যায় যে কেউ টের পাবে না এবং সুনাম নষ্ট হবে না, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। এটাও একটা পলিসী।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, সততাকে শাশ্বত মূল্যমান হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। "Honesty is eternal virtue" (সৎ গুণ)–এ কথার স্বীকৃতি উপরোক্ত পলিসিতে নেই।

সততার স্বার্থেই সৎ থাকতে হবে এমন নয়। এ ক্ষেত্রে সততা যেন উদ্দেশ্য নয়, মাধ্যম মাত্র। উন্নতি, সমৃদ্ধি ও পার্থিব লাভের স্বার্থেই সততা পলিসি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে যদি সততা উন্নতির পথে বাধা মনে হয় তাহলে অসততার মাধ্যমেই উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। এটাই পলিসী।

এ পলিসী মার্কা সততাই দুনিয়ায় চালু রয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী একজন ব্যবসায়ী সততা পালন করে নিজের ব্যবসার উন্নতির জন্য। কিন্তু তিনি ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য ব্যবসায়ীদেরকে পেছনে ঠেলে দিতে অসততা অবলম্বন করাকে ঐ পলিসির বিরোধী মনে করেন না। কারণ তার উন্নতির উদ্দেশ্যে এটা করা হচ্ছে। আর উন্নতি করাই তো আসল উদ্দেশ্য। সততা তো উদ্দেশ্য নয়। এ নীতি অনুযায়ীই ইংরেজ জাতি নিজের দেশের মানুষের জন্য যেসব অধিকার সংরক্ষণ করেছে, তা থেকে অধীনস্ত দেশের মানুষকে বঞ্চিত করা কর্তব্য মনে করেছে। এটাকে তারা সততার বিরোধী মনে করেনি। কারণ নিজের দেশের উন্নতির জন্য এ পলিসীই তাদের প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সরকারে এ পলিসিই চালু রয়েছে। সততা কোথাও ভারচু বা সৎ গুণ হিসেবে চালু নেই।

বাস্তবে এ জাতীয় সততা মোটেই সত্যিকার সততা বলে গণ্য হতে পারে না। মূল্যবোধ ও মূল্যমান হিসেবে সততাকে গ্রহণ না করলে প্রকৃত সততা সৃষ্টি হতে পারে না। 'ভারচু' হিসেবে সততা অবলম্বন করলে সকল অবস্থায়ই তা পালন করার মনোভাব সৃষ্টি হতো। এ জাতীয় সততাই খাঁটি। সবার সাথে সততার ভিত্তিতে আচরণ তখনই সম্ভব যখন সততাকে একটি মহৎ গুণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

সৎ লোক তৈরীর উদাহরণ

যে মহান স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনিই সততার উৎস। তিনি পরম সৎ বলে তার খলীফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্য যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন তাকে সৎ হবার ব্যবস্থাও দান করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ীই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ সৎ লোক তৈরী করার মাধ্যমেই তাদের মিশন শুরু করেছেন।

মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রেরিত ভারসাম্যপূর্ণ বিধানকে মানব রচিত বিধানের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সাঃ)কে পাঠানো হয়েছে বলে কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা তাওবা ৩৩, ফাত্হ ২৮ ও সাফ ৯ আয়াত)।

সমাজকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গড়ে তুলবার দায়িত্ব রাসূলের পক্ষেও একা পালন করা সম্ভব নয়। তাই রাসূল (সাঃ) ১৩ বছর কঠোর পরিশ্রম করে একদল সৎ লোক তৈরী করলেন।

রাসূল (সাঃ) এসব তৈরী সৎ লোকদের নিয়ে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার পর দশ বছরের মধ্যে গোটা আরব উপদ্বীপে আল্লাহর বিধান চালু হয়ে গেল যা আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে সকল যুগেই প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

খাঁটি সৎ লোক তৈরীর একমাত্র পদ্ধতি

যে যুগে রাসূল (সাঃ) বর্বর ও অসভ্য আরব সমাজে পয়দা হন সে সময় রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য সভ্যতার পতাকাবাহী ছিল। আল্লাহ পাক এ

www.pathagar.com

প্রমাণ করলেন যে, আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে অসভ্যতম সমাজের মানুষও বিশ্বসভ্যতার নেতৃত্ব দেবার যোগ্য হতে পারে। ঐ পদ্ধতি মানব প্রকৃতির উপযোগী এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবধর্মী।

যারা রাসূল (সাঃ)কে নবী বলে মেনে নিলেন তাদেরকে তিনি মানব জীবনের আসল লক্ষ্য স্থির করার পরামর্শ দেন। এ দুনিয়ার উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দকে চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করা যে একেবারেই ভুল, সে কথা বুঝাবার উপরই তিনি সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেন। আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যই যে দুনিয়ার যাবতীয় কর্মতৎপরতার আসল টারগেট হওয়া উচিত, সে বিষয়ে তাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করেন। দুনিয়ার সবকিছু ভোগ করার অধিকার মানুষকে অবশ্যই দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু দুনিয়া যে কৃষি ক্ষেত্র মাত্র এবং মৃত্যুর পর আখিরাতে এর ফল পাওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই যে সবকিছু করতে হবে এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করার তিনি নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করার পর ঐ লক্ষ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করতে সক্ষম। তার মেধা, সময়, শ্রম, অর্থ ও আবেগ সবকিছুই নির্দিষ্ট টারগেটে পৌছার জন্য সে ব্যয় করে থাকে। রাসূল (সাঃ) মানুষকে এত উচ্চ ও মহান লক্ষ্যের সন্ধান দিয়েছেন যার জন্য দুনিয়ার জীবনের সবকিছু কুরবানী করতেও সে দ্বিধা করবে না।

আসলে মানুষের সবকিছুই এ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যে, সে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে কোন্ পথ গ্রহণ করেছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জন করাকে যে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, সে জেল-ফাঁসির পরওয়া করে না। যে পেশায়ই কেউ প্রতিষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে সফল হবার জন্য রাতের ঘুম ও দিনের আরাম হারাম করতেও পিছপা হয় না। তেমনি যে ব্যক্তি আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ লাভকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, তার পক্ষে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য বিবেকের বিরুদ্ধে চলা অসম্ভব।

কুরআন পাকে বারবার বিভিন্নভাবে একথা বুঝানো হয়েছে যে, মৃত্যুর পরপারে দুনিয়ার জীবনের যে হিসাব দিতে হবে, সে বিষয়ে উদাসীন থাকার কারণেই মানুষ অসৎ হয়। আল্লাহ বলেন, মৃত্যুর পর আবার যে জীবিত হতে

www.pathagar.com

হবে এ কথা মানুষ এ জন্য বিশ্বাস করতে চায় না যে, সে মন্দ কাজ করতে আগ্রহী। (সূরা আল-কিয়ামাহ-৫ নং আয়াত)।

বলিষ্ঠ চরিত্রের সৎ লোক তৈরী করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে বিধান দিয়েছেন এর মূল কথা তিনটি ঃ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এটাই কুরআনের বুনিয়াদী শিক্ষা। তাওহীদের সার কথা হলো আল্লাহকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র হুকুমকর্তা মেনে চলা এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী সবার হুকুমকে অমান্য করা। রিসালাতের মর্মকথা হলো-জীবনের সব ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)কে একমাত্র অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে মানা এবং রাসূলের শিক্ষার বিরোধী কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা। আর আখিরাতের বিশ্বাসের তাৎপর্য হলো মৃত্যুর পর চিন্তা ও নিয়ত এবং শ্রম ও কর্মের হিসাব দিতে হবে মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা।

সত্যিকার সৎ লোক তৈরী করার এটাই একমাত্র উপায়। অন্য কোনোভাবে খাঁটি চরিত্রবান লোক তৈরী করা সম্ভব নয়। আর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এ ধরনের লোকের হাতে থাকলেই সমাজে শান্তি কায়েম থাকতে পারে। নেতা ও কর্তাদেরকে আল্লাহর ভয় ও বিবেক যদি নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে তাদের উপর আইন ও ডিসিপ্লিন প্রয়োগ করার উপায় নেই।

সৎ লোকের শাসনের গুরুত্ব

সর্বক্ষেত্রেই নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব যারা পালন করেন তাদের সততার অভাব হলে এর কোন প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। কর্তৃত্ব যাদের হাতে থাকে, তারা অধীনস্থদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন ও প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু কর্তা স্বয়ং দুর্নীতি করলে উপায় কি? "রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে দিবে তাহারে সাজা"-কবির এ কথা কত বাস্তব সত্য? বেড়া-ই যদি ক্ষেত খায় তাহলে কে ফেরাবে? দারোগা চুরি করলে কে ধরবে?

যত আইনই রচনা করা হোক, সে আইন প্রয়োগের দায়িত্বশীলরা সৎ না হলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঘুষের জোরে বড় বড় অপরাধী রেহাই পায়, আর ঘুষ দিতে অক্ষমতার কারণে নির্দোষ লোককেও মামলায় ঝুলতে হয়। এ জাতীয় উদাহরণ অগণিত।

www.pathagar.com

নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্বে সৎ লোক থাকলে অধীনস্থদের মধ্যেও সহজেই সততা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা, সরকারী ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কোথাও সৎ লোক তৈরীর কোন পরিকল্পনা আছে বলে আমার জানা নেই। এ অবস্থায় সৎ লোকের শাসন কি করে আশা করা যায়?

সৎ লোক তৈরীর কর্মসূচী ছাড়া দেশ গড়ার বুলি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণেই এ দেশে যারা আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায়, তারা সৎ লোক তৈরীর উপর সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।

দেশ গড়ার দ্বিতীয় উপাদান

দেশ গড়ার প্রথম ও প্রধান উপাদান হলো সৎ লোক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর দেশ গড়ার দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে লিখছি।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনই মানুষের সহজাত দাবী। পরিবার হলো ক্ষুদ্রতম সমাজ। আর রাষ্ট্র হলো বৃহত্তম সামাজিক সংস্থা। একটি সুখী ও শান্তিময় পরিবার গড়ে তুলতে হলে স্বামী ও স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতা, ভাই ও বোন, দাদা ও দাদী এবং পরিবারের বাইরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান থাকা প্রয়োজন, যা মেনে চলতে সবাই রাজী। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক যে আবেগ সৃষ্টি করে, তা অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধন হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক বিধান অপরিহার্য।

তাহলে একটি রাষ্ট্রে যেখানে কোটি কোটি মানুষ বসবাস করে, সেখানে যে অগণিত সম্পর্কের ব্যাপার রয়েছে, এর জন্য নিয়ম-কানুন আরও বেশী জরুরী। তাই সকল দেশেই শাসনতন্ত্র, আইন, আইন রচনার ব্যবস্থা, বিচার ও শাসন পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়। একটি রাষ্ট্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তি ও সংস্থায়, সংগঠনে সংগঠনে,সরকার ও জনগণে, সরকারের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগে পারস্পরিক সম্পর্ক যে কত ব্যাপক ও জটিল, তা সহজেই ধারণা করা যায়।

www.pathagar.com

তাছাড়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্যও আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে।এমন কি যুদ্ধ, সন্ধি, যুদ্ধবন্দী বিনিময় ইত্যাদির জন্যও বিধি–বিধানের প্রয়োজন রয়েছে।

তাহলে দেখা গেল পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিধি–বিধান প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, এসব বিধান কিভাবে যোগাড় করা যাবে? বিধান ছাড়া যেহেতু চলে না, সেহেতু মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিধান রচনা করতে বাধ্য হয়। এসব মানব রচিত আইন–কানুন ও বিধি–বিধান সমাজকে শান্তিময় এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে সন্তোষজনক করার উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সে মহান উদ্দেশ্য সফল হয় না। বারবার ভুল প্রমাণিত হয় এবং সংশোধন করতে হয়। এর পরও কাংখিত সুফল পাওয়া যায় না। মানব জাতির ইতিহাস এ কথারই সাক্ষী।

সৃষ্টি জগতে পশু–পক্ষীর মধ্যেও সমাজবদ্ধ জীবন রয়েছে। তাদের মধ্যে কি পারস্পরিক সম্পর্কের এমন দুরবস্থা দেখা যায়–যা মানুষের মধ্যে রয়েছে? জ্ঞান–বুদ্ধি ও মননশীলতায় সৃষ্টির সেরা মানুষের এ দশা কেন?

কুরআনে এর সঠিক জবাব সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। বহু আয়াতের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার অবকাশ এখানে নেই। কুরআনে পারদর্শী সবাই এ জবাব সম্পর্কে একমত। সে জবাবটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর সার কথা ঃ

"জলে স্থলে যে অশান্তি ও বিশৃংখলা তা মানুষেরই হাতের কামাই। মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধানকে মেনে না চলার কারণেই অশান্তি ভোগ করছে। সৃষ্টি লোকের প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ এর উপযোগী বিধান রচনা করে নিজেই তা চালু করেছেন। তাই মানুষ ও জিন ছাড়া সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলছে। এসব বিধান কোন নবীর মাধ্যমে না পাঠিয়ে আল্লাহ সরাসরি কায়েম করেছেন। কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ যে জীবন বিধান রচনা করেছেন, তা তিনি সরাসরি কায়েম করেননি এবং তা মেনে চলার জন্য মানুষকে বাধ্যও করেননি। এ বিধান নবীর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে–যাতে আল্লাহর নির্দেশ মতো তা বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দিতে পারেন।"

www.pathagar.com

এখন দেশ গড়ার জন্য যে বিধি বিধান প্রয়োজন তা কি আমরা আল্লাহ ও রাসূল থেকে নেব, না নিজেরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে রচনা করব–এ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কুরআনের মতে যারা আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়, তারাই মুসলিম। আমরা যারা মুসলিম হওয়ার দাবীদার, তাদেরকে কুরআন এ অধিকার দেয়নি যে, কুরআনের কতক বিধান গ্রহণ করবে এবং কতক বাদ দিবে। ধর্ম সংক্রান্ত নির্দেশ মেনে নিয়েও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান মানতে অস্বীকার করার কোন ইখতিয়ার তাদের নেই–যারা কুরআনের উপর ঈমান আনার দাবীদার।

ইসলামী রাষ্ট্রের আইন সভা শুধু ঐ সব বিষয়ে আইন রচনা করার অধিকার রাখে, যা আল্লাহর আইনের বিরোধী নয়। আল্লাহর আইন সংশোধন করারও কোন অধিকার আইন সভার নেই।

আইন–সভা অবশ্যই প্রয়োজনীয় যাবতীয় আইন রচনা করতে থাকবে। আল্লাহর আইনের মহান উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই আইন সভাকে বহু বিস্তারিত আইন রচনা করতে হবে।

আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি

দেশ গড়ার মূল দায়িত্ব সরকারের আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত রাজনৈতিক দলই সরকার পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং দেশ গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের উপরই বর্তায়।

দেশ গড়ার কাজটির ব্যাপকতা এটাই দাবী করে যে, কোন একটা আদর্শের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা নিতে হবে। জনগণের মন–মগজ–চরিত্র গঠন, পারিবারিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুকরণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ কাঠামো নির্মাণ, সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ইত্যাদি একই আদর্শ অনুযায়ী করা না হলে দেশ গড়ার কাজ সফল হতে পারে না।

সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোকে কোন নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতেই দেশ গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দলের নেতা ও কর্মীদেরকে ঐ আদর্শে গড়ে উঠতে হবে। ঐ আদর্শের রূপরেখা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

www.pathagar.com

জনগণ সে আদর্শের পক্ষে নির্বাচনে রায় দিলে দেশ গড়ার দায়িত্ব ঐ দলের উপরই আসবে। এভাবেই আদর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি চালু হতে পারে।

বাংলাদেশের আদর্শ কী?

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারীগণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের স্থলে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয়। আর "সমাজতন্ত্র" শব্দটি বহাল রেখে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার" অর্থে ব্যবহার করায় সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে অস্বীকারই করা হয়েছে।

১৯৯২ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র শব্দটি পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শব্দটি বহাল রাখলেও-এর আসল বিশ্বময় স্বীকৃত সংজ্ঞার বদলে এমন অর্থ করা হয়েছে-যা এর উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করার শামিল।

এখন বাকী রইল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। গণতন্ত্র দেশ গড়ার আদর্শের দাবী পূরণ করে না। গণতন্ত্র হলো সরকার গঠন ও মতামত প্রদানের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মত ও পথের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার আচরণবিধি মাত্র। ব্যক্তি, পরিবার, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োজন, তা সরবরাহ করা গণতন্ত্রের সাধ্যের বাইরে। তাই এ সবের জন্য চাই একটি আদর্শ।

জাতীয়তাবাদও দেশ গড়ার আদর্শের প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম। জাতীয়তাবাদ হলো কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধের চেতনা। এ চেতনা জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠীকে ভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়। আমাদের দেশে এর দুটো উদাহরণ রয়েছে। বিগত ৪০-এর দশকে অবিভক্ত ভারতের দশ কোটি মুসলমান ৩০ কোটি অমুসলিম থেকে একটি পৃথক জাতি হিসেবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করার ফলে ভারত বিভক্ত হলো এবং স্বাধীন পাকিস্তান কায়েম হলো। পাকিস্তান ঐ মুসলিম জাতীয়তাবোধেরই ফসল।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে এদেশে বাংগালী জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ থেকে পৃথক জাতিসত্তার প্রবল অনুভূতি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সক্ষম হলো।

কিন্তু মুসলিম জাতীয়তাবাদ পাকিস্তান কায়েম করলেও দেশ গড়ার আদর্শ হিসেবে কোন অবদান রাখতে সক্ষম হলো না। তেমনি বাংগালী জাতীয়তাবাদ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিলেও দেশ গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শের প্রয়োজন পূরণ করতে পারল না।

বিশ্বে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও রক্তের ভিত্তিতে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ কোন ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে গণ্য নয়। জাতীয়তাবাদ নেতিবাচক আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং পৃথক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে অবদান রাখার যোগ্য। দেশ গড়ার ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে কোথাও জাতীয়তাবাদ কোন অবদান রাখেনি।

এ দেশে জাতীয়তাবাদ জাতীয় ঐক্যের বদলে বিরোধ সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এদেশবাসীর জাতীয়তা কি বাংলাদেশী, না বাংগালী–এ বিতর্কের এখনও অবসান হয়নি। আমরা বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক সত্তার অধিকারী, না ভিন্ন রাষ্ট্রের বাংগালীদের সাথে মিলে আমরা এক অবিভাজ্য বাংগালী জাতি–এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

জাতীয়তাবাদ নিয়ে আমরা এ বিতর্কে লিপ্ত থাকি বা না থাকি, দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এর তেমন কোন অবদান লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। দেশ গড়ার কাজের যে আলোচনা আমরা শুরুতেই করেছি, সে বিবেচনায় জাতীয়তাবাদ কোন আদর্শ হিসেবে অবদান রাখতে অক্ষম। তাহলে আমরা এখন কোথায় আছি? বাংলাদেশের কোন সর্বস্বীকৃত আদর্শ আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেল না।

জাতীয় আদর্শ শিশুর খেলনা নয়

ধর্ম–নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে শাসনতন্ত্রে একবার জাতীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। কয়েক বছর পর শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত হয়ে গেল। সমাজতন্ত্র একেবারেই পরিত্যক্ত বলে গণ্য হলো। জাতীয় আদর্শের মতো এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শিশুর খেলনায়

www.pathagar.com

পরিণত করার এমন লজ্জাকর উদাহরণ আর কোথাও আছে কি না জানি না। আমাদের দেশে এমনটা ঘটবার সংগত কারণ আছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন ভিত্তি এ দেশের মাটিতে নেই। এটা পরগাছা। ভারত থেকে আমদানি করে এটাকে জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। জনগণের সম্মতি বা মেন্ডেট ছাড়াই ৭২ সালে এটাকে শাসনতন্ত্রে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই তো এ ভূখন্ডটি ভারত থেকে পৃথক হয়ে এসেছে। আর যে জাতীয়তাবোধ এ দেশকে ভারত থেকে পৃথক অস্তিত্ব দিয়েছে তা বাংগালী জাতীয়তা নয়, মুসলিম জাতীয়তা। এদেশবাসী বাংগালী জাতীয়তায় বিশ্বাসী হলে পশ্চিম বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ আলাদা হতো না।

আর সমাজতন্ত্র রাশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছিল। এদেশে এর কোন ভিত্তি ছিল না। এখন খোদ রাশিয়াতেই সমাজতন্ত্র আত্মহত্যা করার পর সর্বত্রই এটা পরিত্যক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে এখনও এ শব্দটি টিকে আছে। শাসনতন্ত্র এ শব্দটি থেকে অবশ্যই পবিত্র হবে। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এভাবেই প্রমাণিত হলো যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কোন শিকড় বাংলার মাটিতে ছিল না। শিকড়বিহীন বলেই এদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। ভারত ও রাশিয়া থেকে এ দুটো পরগাছা এনে বাংলাদেশের বৃক্ষে সেঁটে দেয়া হয়েছিল কিন্তু বৃক্ষটি তা গ্রহণ করেনি।

ইসলামই বাংলাদেশের আদর্শ

দেশ গড়ার জন্য ইসলাম ছাড়া আর কোন আদর্শের সন্ধান যদি কারো কাছে থাকে, তাহলে পেশ করুন। দেশ গড়ার কাজের যে ব্যাখ্যা শুরুতে দেয়া হয়েছে, সে কাজের উপযোগী কোন আদর্শ প্রধান দলগুলোর নিকট আছে বলে আমার জানা নেই। থাকলে অবশ্য সবাই জানতে পারতেন। কারণ দলীয় আদর্শ তো প্রচার করারই বিষয়। একটি দলের প্রায় এক কুড়ি দফার মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধও একটি দফা। এর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা কোন ধারণা দেশবাসীকে দেননি। ঐ ধারণাটির বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

ইসলামী আদর্শ এ দেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকেই এ দেশের মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বর্ণবাদী নির্যাতনের শিকার এ দেশের জনগণ ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যেই মুক্তির সন্ধান পায়। ১২০১ সাল থেকে এ দেশে মুসলিম শাসন শুরু হয়। মুসলিম শাসনের পূর্বের শাসকদের সাথে তুলনা করে এ দেশের জনগণ জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে মুসলিম শাসনকে কল্যাণকর পেয়েছে বলেই তারা বিদ্রোহ করেনি। নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত ৬৫০ বছর মুসলিম শাসকদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইও হয়েছে। কিন্তু কোন গণবিদ্রোহ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এর কারণ প্রধানতঃ ইসলামী আইনের প্রচলন, সুবিচার, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, ধর্মীয় উদারতা ও মানুষে মানুষে সাম্যের সম্পর্ক স্থাপন। এদেশের অমুসলিমরাও ধর্মে বিশ্বাসী। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইসলামী সুবিচার ও ইনসাফের যে বিধান রয়েছে, তা গ্রহণ করতে তাদের আপত্তির কোন কারণ নেই। তারা ইসলামের বদলে স্বৈরশাসন, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বেশী পছন্দ করবেন বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা ৯০ জন মুসলমান–যারা আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)কে মহব্বত করে এবং আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআনকে অন্তর দিয়ে ভক্তি করে। বিগত ২৫০ বছরের অনৈসলামী শাসনের কারণে মুসলিম জনগণের বিরাট অংশ ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র থেকে বঞ্চিত হলেও আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত, কুরআন, হাদীস ইত্যাদির উপর তাদের ঈমান রয়েছে। তাই ১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সন্নিবেশিত হওয়ায় গণভোটে মুসলিম জনগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ৫ম সংশোধনীর পক্ষে ভোট দেয়।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত মহলের একাংশ আল্লাহর আইন ও খেলাফতী শাসন ব্যবস্থা না চাইলেও শিক্ষিত মুসলমানদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠই এর পক্ষেই রয়েছে। যারা ইসলামী রাষ্ট্র চান না, তাদেরও প্রকাশ্যে সে কথা বলার সাহস নেই। সরাসরি এ কথা কেউ বলতে পারেন না কেন যে, "বর্তমান যুগে কুরআনের আইন অচল, ইসলাম প্রগতির পথে অন্তরায়, ইসলামের বিচার ব্যবস্থা সভ্য সমাজের উপযোগী নয় ইত্যাদি।"

www.pathagar.com

এভাবে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে বলার সাহস না থাকাই প্রমাণ করে যে, তারা বিশ্বাস করেন যে, জনগণ ইসলামের পক্ষে রয়েছে। এ কারণেই নির্বাচনে মুসলিম ভোটারদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে "নৌকার মালিক তুই আল্লাহ" এবং "ধানের শীষে বিসমিল্লাহ" শ্লোগান দিতে হয়।

জনগণ ইসলাম চায় বলেই এরশাদ সাহেব জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে বলতেন, "আমি মদীনার ইসলাম চাই, মওদূদীর ইসলাম চাই না।" ৯ বছরে স্বৈরশাসনকালে তিনি কোন ইসলাম কায়েম করেছেন, তা সবারই জানা। সুতরাং যারা ইসলাম চান না, তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার হিম্মত রাখেন না একমাত্র জনগণের ভয়ে।

যারা ক্ষমতায় ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যেতে চান, তাদেরকে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, আপনারা কোন্ আদর্শে দেশকে গড়ে তুলতে চান, বলুন। দেশের জনগণ ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। যদি আপনারা এ আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে কাজে-কর্মে বাস্তবে তা প্রমাণ করুন। আর যদি ইসলামী আদর্শ না চান, তাহলে আপনাদের পক্ষে বাংলাদেশকে গড়ে তোলা কি করে সম্ভব হবে?

যারা এদেশে রাজনীতি করছেন তাদের জন্য দু'টো পথ রয়েছে ঃ

১। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তুলবার জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করুন। জনগণ যদি আপনাদের পরিবেশিত ইসলামকে গ্রহণ করে, তাহলে তাই জাতীয় আদর্শ বলে গণ্য হবে।

২। আপনারা যে আদর্শে দেশকে গড়তে চান, তা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করুন-যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, আপনারা কি চান।

আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি ছাড়া শুধু ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে রাজনীতি আর জনগণ কবুল করবে না। এ পর্যন্ত কোন্ দল দেশের জন্য কী করেছে, তা জনগণ অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করতে থাকবে।

বাংলাদেশে রাজনীতির ধরন

বৃটিশ রাজত্ব উৎখাত করে দেশ স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যে বিক্ষোভ মার্কা রাজনীতি (Agitational Politics) শুরু হয়েছিল, আজও রাজনীতির ধরন তাই রয়ে গেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে যদি সত্যিকার গণতন্ত্র চালু হতো, তাহলে

www.pathagar.com

হয়তো ধীরে ধীরে বিক্ষোভ মার্কা রাজনীতির বদলে গঠনমূলক রাজনীতির বিকাশ সম্ভব হতো। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এ জাতীয় রাজনীতি প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি আদর্শভিত্তিক ও গঠনমূলক না হবার বড় কারণ হলো–ক্ষমতার রাজনীতি (Power Politics)। যেমন করেই হোক ক্ষমতায় যেতে হবে–এটাই যদি রাজনীতির চরম লক্ষ্য হয়, তাহলে যে দশা আমাদের হয়েছে এ থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

একথা ঠিক যে ক্ষমতা হাতে না পেলে আদর্শও কায়েম করা যায় না। কিন্তু আদর্শের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা চাওয়া আর মন্ত্রীত্ব ও বিবিধ স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষমতা লোভী হওয়া এক কথা নয়। গত ২০ বছরে এ ক্ষমতার রাজনীতিই এদেশে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। যে কয়টি সরকার এ সময় কায়েম হয়েছে, তাতে বেশ কিছু ব্যক্তি এমনও রয়েছেন যারা একাধিক সরকারের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর তাঁর মন্ত্রিসভার অনেকেই মুশতাক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। জেনারেল জিয়ার আমলে বিভিন্ন দলের প্রথম সারির নেতারা মন্ত্রী হয়েছেন। এরশাদ সাহেব অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার পর জিয়া মন্ত্রিসভার জাঁদরেল মন্ত্রীরা স্বৈর সরকারের মন্ত্রী হলেন। যদি আদর্শই রাজনীতির উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এক দলের নেতা আর এক দলীয় সরকারের নেতা হতে পারতেন না। এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নীতি বা আদর্শ নয়, ক্ষমতাই রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে আছে।

নেতাদের কোন্দলে দল ভেঙ্গে যাওয়া, পদ না পেলে দলত্যাগ করা, পদ পাওয়ার জন্য অন্য দলে যোগদান করা, নেতৃত্বের প্রয়োজনে নাম সর্বস্ব দল গঠন করা, সুযোগ সুবিধার লোভে ক্ষমতাসীন দলে ভীড় জমানো ইত্যাদি সুস্থ ও গঠনমূলক রাজনীতির পরিচয় বহন করে না। আদর্শভিত্তিক রাজনীতিতে এ জাতীয় কার্যকলাপ চলতে পারে না।

আদর্শকে ক্ষমতাসীন করাই আদর্শবাদী রাজনীতির লক্ষ্য। যারা এ রাজনীতি করে তারা মন্ত্রী হবার জন্য দল বদল করে না।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আকুল আবেদন

দেশ গড়ার প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। গণতান্ত্রিক দেশে সরকার পরিচালনার সুযোগ রাজনৈতিক দলকেই দেয়া হয়। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমি কয়েকটি বিষয়ে আকুল আবেদন জানাই ঃ

১। আসুন, আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত হই যে, গত ৯১-এর নির্বাচনের মতো প্রতিটি নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করি।

২। আসুন, আমরা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ মার্কা রাজনীতির (Agitational Politics) বদলে গঠনমূলক রাজনীতি (Constructive Politics) দেশে চালু করি। কথায় কথায় হরতাল, ঘন ঘন হরতাল, গাড়ী ভাংচুর ও পেশী শক্তি প্রয়োগের রাজনীতির অবসান হওয়া প্রয়োজন। আমাদের গরীব দেশ এ জাতীয় রাজনীতির ধাক্কা সামলাতে অক্ষম।

৩। যেহেতু কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে কোন দলীয় সরকারই অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সুযোগ পাবে না, সেহেতু নির্বাচিত সরকারকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দেশ পরিচালনার অধিকার দিতে হবে। সরকারের ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেয়া ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার সাথে সাথে দেশ গড়ার ব্যাপারে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে জনমত গঠনের দায়িত্ব বলিষ্ঠভাবে পালন করতে থাকাই বিরোধী দলের দায়িত্ব।

সরকার পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অন্য উপায়ে সরকারের পতনের চেষ্টা করা হলে সরকার গদী রক্ষায়ই মেধা, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে বাধ্য হয়, দেশের কাজ করার ফুরসত পাবে কোথায়?

৪। উল্লেখযোগ্য দলগুলোর নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক আচরণবিধি প্রণয়ন করে তা মেনে চলার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন। গণতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে বহাল রাখার জন্য এটা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

৫। কোন ব্যক্তিকে দলের স্থায়ী আদর্শের মর্যাদা দেয়া গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের পরিপন্থী। রাজনৈতিক দর্শন, দলীয় কর্মসূচী ও নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোকেই দলীয় আদর্শ হিসেবে জনগণের নিকট পেশ করা উচিত। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দলের আদর্শ মেনে নিলে সে দলের নেতৃত্ব যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারণের পরিবর্তে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট হতে বাধ্য।

৬। গণতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কম হওয়া প্রয়োজন। প্রাক্তন মন্ত্রী বা বয়সে প্রবীণ হওয়ার কারণে বা নামকরা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির সন্তান হওয়ার সুবাদে রাজনৈতিক দলের প্রধান হয়ে থাকা দেশ গড়ার জন্য জরুরী নয়। এসব অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুসংগঠিত দলগুলোতে শামিল হলে দেশের কল্যাণ হতে পারে। অবশ্য নিয়মিত নির্বাচন হতে থাকলে এসব দলের স্বাভাবিক মৃত্যুর মাধ্যমে দলের সংখ্যা কমে যেতে পারে।

৭। সকল দলের নিকটই আমি বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি যে, ইসলামী জীবন বিধানকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা, তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় যারা "নৌকার মালিক তুই আল্লাহ" এবং "ধানের শীষে বিসমিল্লাহ" শ্লোগান দেয়া প্রয়োজন মনে করেন, তারা নিশ্চয়ই কুরআনকে আল্লাহর বাণী এবং রাসূল (সাঃ)কে আদর্শ মানব বলে বিশ্বাস করেন। তাহলে কুরআনের আইন ও রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়?

গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ বিষয়টা বিবেচনার দাবী রাখে। কুরআনকে উৎখাত করার কোন উপায় নেই বলে এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধান দেশে কায়েমের আন্দোলনকে নির্মূল করার সাধ্যও কারো নেই। রাজনৈতিক অংগনকে আদর্শিক সংঘাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে গণতন্ত্রের বিকাশ অসম্ভব। তাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে, "ধর্মকে রাজনৈতিক ময়দানে আনা চলবে না" "মসজিদে রাজনৈতিক কথা বলতে দেয়া হবে না" ইত্যাদি সন্ত্রাসী ভাষা ব্যবহার না করে ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামী আদর্শের ধারক না হওয়া পর্যন্ত আদর্শিক সংকট দূর হবে না।

www.pathagar.com

সবাই একটু ভেবে দেখুন যে, আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) কে স্বীকার করার পর আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহকে মেনে না নেবার কি যুক্তি থাকতে পারে?

দেশ গড়ার কাজ

ইসলামের দৃষ্টিতে দেশ গড়ার কাজকে "রুবুবিয়াত"–এর কাজ বলা যায়। 'রব' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। আল্লাহ তায়ালা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই মানুষের নিকট রব হিসাবে নিজেকে পেশ করেছে। রাসূল (সঃ)–এর নিকট প্রথম অহী "ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক" আয়াতটিতে 'রব' গুণটিই উল্লেখ করেছেন। এর অনুবাদ হলো, "হে রাসূল আপনি আপনার ঐ রবের নাম নিয়ে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন।" এরপর সূরা আল ফাতিহাতে (যা পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাযিল হয়) আল্লাহ পাক পয়লাই "রাব্বুল আলামীন" হিসাবে নিজের পরিচয় দিলেন। অর্থাৎ তিনি শুধু মানুষের রব নন, গোটা বিশ্ব জগতের রব।

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য যে নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে রুকু ও সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম ও আলা' পড়ার হুকুম করা হয়েছে। এখানেও রব হিসাবেই আল্লাহকে স্মরণ করতে হয়। 'রাব্বিয়া' মানে আমার রব। রুকু ও সিজদায় রোজ শত শতবার আমার 'রব' বলার মাধ্যমে পরম ঘনিষ্ঠ ও মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নামের মধ্যে 'রব' গুণটির উপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই এত বেশী গুরুত্ব কেন দিলেন? কারণ আল্লাহর সৃষ্টির সাথে যে গুণটির মাধ্যমে আলাহর সবচাইতে বেশী সম্পর্ক, সে গুণটিই হল 'রব'।

আমরা রব শব্দের অনুবাদ করে থাকি প্রতিপালক বা লালন–পালনকারী। পিতা–মাতা সন্তাকে যে লালন–পালন করেন, তাও কুরআনে 'রাব্বায়ানী' (আমাকে দুজনে লালন–পালন করেছেন) শব্দেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শুধু লালন–পালন দ্বারা 'রব' শব্দের ব্যাপকতা স্পষ্ট হয় না।

কুরআনের তফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাপক ও গভীর ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যার সার কথা হলোঃ

www.pathagar.com

"প্রতিটি সৃষ্টির বিকাশ ও পূর্ণতার জন্য যত কিছু প্রয়োজন তা জানা, সে অনুযায়ী সব জিনিস সৃষ্টি করা, যখন যা যে পরিমাণ দরকার তা সরবরাহ করা এবং তার পরিণতি পর্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা।"

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পৃথিবীর সব কিছু কাজে লাগাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি যে সৃষ্টিকে যে উদ্দেশ্যে পয়দা করেছেন, সে কাজেই তা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সৃষ্টি জগত সবটুকুই মানুষের কর্মক্ষেত্র এবং মানব দেহ হচ্ছে এ জগতকে ব্যবহার করার উপযোগী হাতিয়ার। বিশ্ব জগতের রব তার সৃষ্টির লালন-পালনের যে কাজ করছেন, সে কাজই একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষকে করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত মানুষকে যত ইখতিয়ার বা ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করাই হলো আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব।

আমরা যখন দেশ গড়ার কাজ নিয়ে চিন্তা করি, তখন এ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব হলো মানব সমাজকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা। বিধান আল্লাহর, কিন্তু সে বিধান তিনি নিজে জারি করেন না। তাঁর পক্ষ থেকে মানুষকে ঐ বিধান জারি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে বলেই এটা তাঁর প্রতিনিধিত্ব।

আল্লাহর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালন করা হলে রুবুবিয়াতের দায়িত্বই প্রধান স্থান অধিকার করে।

আল্লাহ পশু-পক্ষীকে যেভাবে সরাসরি লালন-পালন করছেন, মানুষকে সেভাবে প্রতিপালন না করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বিধি-বিধান পাঠিয়েছেন। সে বিধান অনুযায়ী আল্লাহর সৃষ্টি জগত থেকে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব মানুষের উপরই অর্পণ করেছেন। এ দায়িত্ব পালন করাই হলো রুবুবিয়াত বা প্রতিপালনের কাজ।

কুরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষসহ সকল প্রাণীর রিয্‌কই তিনি পয়দা করেন। কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ যা সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেন, তা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিলি-বন্টন হয় না বলেই কতক মানুষ অতিরিক্ত ভোগ করে, কিছু অপচয় ও নষ্ট করে, আর বাকী লোকের সর্বনিম্ন প্রয়োজনও পূরণ হয় না।

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে দেশ গড়ার কাজ বলতে এটাই বুঝায় যে, আল্লাহ যদি পশু-পক্ষীর মতো মানুষকেও সরাসরি লালন-পালন করতেন, তাহলে যেমন কোন মানুষের অভাব থাকতো না, কারো উপর যুলুম হতো না। কেউ অপরের হক অন্যায়ভাবে মেরে খেতে পারতো না। তেমনিভাবে ইসলামী সরকারকে দেশের সব মানুষের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই সরকার কায়েম হওয়া দরকার। এ দায়িত্ব পালন করাই আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করলে সরকারের কি প্রয়োজন? এ দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার পছন্দ মতো পালন করার জন্যই কুরআনে মুসলিম শাসকদেরকে ৪ দফা কর্মসূচী দেয়া হয়েছে।

দেশ গড়ার কর্মসূচী

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশ গড়ার উদ্দেশ্যে কুরআন পাকের সূরা আল-হাজ্জ-এর ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে মুসলিম শাসকদের জন্য যে ৪ দফা কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এখানে পেশ করা হচ্ছে।*

সূরা আল-হাজ্জ-এর প্রথম ২৪টি আয়াত হিজরাতের কাছাকাছি সময় নাযিল হয়। হিজরাতের পরপর মদীনায় সূরাটির বাকী অংশ নাযিল হয়েছে। মদীনায় তখন ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হচ্ছিল। এ সময় রাসূল (সঃ) ও তার সাথীদের কারণীয় সম্পর্কে পথনির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে বলেন ঃ

"আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। (তিনি তাদেরকেই সাহায্য করেন) যারা এমন যে যখন আমি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি, তখন তারা

---

* "কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী" নামক আমার লেখা বইটিতে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

নামায কায়েম করে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে, যা বিবেকসম্মত তার আদেশ করে এবং যা বিবেক বিরোধী তা প্রতিরোধ করে। আর সব কিছুর পরিণামই আল্লাহর হাতে রয়েছে।"

এ আয়াত দুটোর প্রথমটিতে আল্লাহতায়ালা তার মুমিন বান্দাহদেরক বলছেন যে, আল্লাহ মহা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে জবরদস্তি করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্বীন কবুল করতে বাধ্য করেন না। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে যারা নিজের ইচ্ছায় ঈমান আনে এবং অন্য মানুষকে ঈমান আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তাদেরকে আল্লাহ তার সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করেন। মানুষের হেদায়াতের ক্ষমতা আল্লাহরই হাতে। তাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবার পর যারা অন্য মানুষকে হেদায়াতের পথে আনার চেষ্টা করে, তারা আল্লাহর কাজেই সহায়তা করে বলে তাদের উপাধি দেয়া হয়েছে আনসারুল্লাহ বা আল্লাহর সাহায্যকারী।

মানুষকে আল্লাহর পথে হেদায়াত করার সবচাইতে কষ্টকর পন্থা হলো আল্লাহর বিধান মানব সমাজে কায়েম করা। মানুষ যেহেতু নিজের কল্যাণ কামনা করে, সেহেতু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবে কায়েম হলে এর সুফল দেখে সবাই আল্লাহর দ্বীনকে ভালবাসবে। তাই দেখা গেল যে, রাসূল (সঃ)–এর দীর্ঘ তের বছর কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ–তিতিক্ষা ও সাধনার ফলে মাত্র কয়েকশ' লোক ঈমান আনলেন। কিন্তু মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বাস্তব রূপলাভ করার পর দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল। ইসলামী জীবন বিধান যে শান্তি ও কল্যাণময় সমাজ গড়তে পারে, তার প্রমাণ বাস্তবে দেখার পর মানুষ তা গ্রহণ না করে কি পারে?

৪১ নং আয়াতে ঐ ৪–দফা কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়েছে– যা মানব সমাজকে আল্লাহর পছন্দনীয় রূপদান করবে। বলা হয়েছে যে, এ চারটি কাজ করা তাদেরই কর্তব্য, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করি। এ চারটি কাজ যারা করবে, তারাই আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। এ আয়াতে মদীনায় শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত সাহাবাগণকে আল্লাহ পাক তাকীদ দিচ্ছেন যে, তোমরা এ কাজগুলো যদি কর–তাহলে আমার সাহায্য তোমরা পাবে এবং তোমাদের এ কাজের ফলে মানুষ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের আগ্রহে আমার দ্বীনের

www.pathagar.com

পতাকাতলে আশ্রয় নেবে, তখন তোমাদেরকে আমার সাহায্যকারীর মর্যাদা দান করা হবে।

ঐ ৪ দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা করার অবকাশ এখানে নেই। উল্লিখিত বইটিতে কুরআন ও হাদীসের দলিল প্রমাণ পেশ করে ঐ দফাগুলোর নিম্নরূপ নামকরণ করা হয়েছেঃ

১। জনগণের চরিত্র গঠন করা।
২। ইনসাফপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করা।
৩। কল্যাণমূলক কাজ চালু করা।
৪। অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা।

৪–দফা কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

১। ৪–দফার প্রথমটি হলো নামায কায়েম করা। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় সৃষ্টি মানুষের যে উন্নত চারিত্রিক মান পছন্দ করেন, এর ভিত্তিই হলো নামায। কুরআন ও হাদীসে নামাযের যেসব উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত উন্নত চরিত্রেরই উপাদান। মুখে উচ্চারণ করে কিছু পড়াই নামাযের উদ্দেশ্য নয়। তাই কুরআনে নামায পড়ার আদেশ করা হয়নি। নামায কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যারা ইসলামকে কতক অনুষ্ঠান সর্বস্ব নিছক একটি ধর্ম মনে করে তারা নামাযকে অন্যান্য ধর্মের পূজা পাঠ জাতীয় অনুষ্ঠান মনে করতে পারে। কিন্তু যারা ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান বলে বিশ্বাস করে এবং সে বিধান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখে, তারা জানে যে, নামায মুমিনের কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অনুষ্ঠান নয়। নামায তার পার্থিব কার্যাবলীকেও ইবাদতে পরিণত করে।

দেশ গড়ার প্রথম ও প্রধান কাজই হলো সৎ মানুষ গড়া। আর সৎ মানুষ গড়ার জন্যই নামাযের বিধান দেয়া হয়েছে। নামাযের পূর্বশর্ত হলো ঈমান– যা চরিত্রের মূলভিত্তি আর নামাযের ফসল হলো নেক আমল বা উৎকৃষ্ট চরিত্র। নামায যে মানের হবে চরিত্রের মানও সে অনুযায়ীই উন্নত হবে। এ কারণে জামায়াতে নামায আদায়ের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নামায ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহুবিধ সামাজিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারে– যদি

www.pathagar.com

নামাযের সকল উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়তে সরকারী উদ্যোগে তা কায়েম করা হয়।

২। দ্বিতীয় দফা হলো যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা। ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে যাকাতকে শুধু খয়রাত ও ভিক্ষাদান ব্যবস্থা মনে করা হয়। ইসলাম ভিক্ষার পেশাকে গুনাহের কাজ বলে ঘোষণা করেছে। অথচ যাকাত আমাদের সমাজে পেশাদার ভিক্ষুকদের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকাই পালন করছে। এ ভাবেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম না থাকায় এর প্রায় সকল বিধি বিধানই বিকৃত আকারে বিরাজ করছে।

যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির প্রধান প্রধান নীতিমালা প্রণয়নে নিম্নরূপ দিকনির্দেশনা দান করেঃ

(ক) একমাত্র হালাল ও বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করতে হবে। কারণ যাকাতের জন্য মাল হালাল হওয়া প্রধান শর্ত। যে হারাম পথে আয় করে সে যাকাতের ধারও ধারে না। সে যাকাত দিলেও আল্লাহ তা কবুল করে না।

(খ) হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদের উপরও নিরংকুশ মালিকানার অধিকার নেই– এ কথা যে মেনে নেয়, সেই অপরের জন্য তার সম্পদের একটা অংশ যাকাত হিসাবে আদায় করতে রাযী হয়। সম্পদের আসল মালিক আল্লাহ– এ কথা মেনে নিলে এ সম্পদ তাঁরই মরযী মতো খরচ করতে হবে।

(গ) বিভিন্ন কারণে যেসব লোকের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের অভাব থেকে যায়, তাদের বিত্তবানদের সম্পদে অধিকার রয়েছে। যাকাত এ অধিকারেরই স্বীকৃতি। যাকাত গরীবের প্রতি ধনীদের দয়া নয়। এটা আল্লাহর দয়া ও ধনীদের কর্তব্য এবং গরীবের হক। এভাবে যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করে।

ইসলাম অর্থনৈতিক যত বিধি–বিধান দিয়েছে তা উপরোক্ত তিনটি নীতিমালারই অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসে যেসব অর্থনৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করণীয়। যাকাত ও সরকারী ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ ও বিলির বিধান দেয়া হয়েছে। তাই যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থারই প্রতীক। ইনসাফপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাই ইসলামী অর্থনীতি আর যাকাতাই এর ভিত্তি।

www.pathagar.com

৩। কল্যাণমূলক কাজ চালু করা ইসলামী সরকারের তৃতীয় কর্তব্য। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং দেশ ও জাতির জন্য যা কিছু কল্যাণকর, তাই আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) মানব সমাজে চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে ঐ সব নির্দেশ আলেমগণ শুধু ওয়াযের মাধ্যমে প্রচার করেন। তাদের তো আদেশ করার ক্ষমতা নেই। তারা শুধু উপদেশই দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে হলেও যাবতীয় কল্যাণকর কাজ চালু করতে হবে। যা বিবেক সম্মত তাই কল্যাণকর। আল্লাহ তায়ালা যেসব বিষয়কে কল্যাণকর বলে চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন তা সবই বিবেক সম্মত।

৪। অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা হলো সরকারের চতুর্থ কর্তব্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ ও জাতির জন্য যা কিছু অনিষ্টকর, তা উৎখাত করা এক ব্যাপক ও বিরাট কাজ। যত রকমের অনিষ্টকর কার্যকলাপ, রীতি–নীতি ও অভ্যাস চালু আছে তা বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলাম সরকারের উপরই ন্যস্ত করেছে। কোন কোন বিষয় অনিষ্টকর তার তালিকাও কুরআন হাদীস থেকে পাওয়া যায়।

সমাজ বিরোধী, নৈতিকতাবর্জিত ও অনিষ্টকর যত কিছু সমাজে চালু আছে, তা প্রায়ই সরকারী অবহেলার কারণেই বিনা বাধায় চলছে। কতক তো সরকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতায়ই চালু আছে। এ কথা সত্য যে, এসবের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ প্রয়োজন। কিন্তু এ সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করাও সরকারেরই দায়িত্ব।

সরকারী উদ্যোগেই জনগণকে সংগঠিত করে যাবতীয় সমাজ বিরোধী ও অনিষ্টকর কার্যকলাপ বন্ধ করা প্রয়োজন। ওয়াজ ও নসিহত দ্বারা জনমত সৃষ্টি করা যায় না। এটা বিরাট কঠিন কাজ– যা সরকারী ক্ষমতা ও আইনের প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সমাজ বিরোধী, নৈতিকতাবর্জিত ও অনিষ্টকর যত কিছু সমাজে চালু আছে, তা প্রায়ই সরকারী অবহেলার কারণেই বিনা বাধায় চলছে। কতক তো সরকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতায়ই চালু আছে। এ কথা সত্য যে, এসবের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ প্রয়োজন। কিন্তু এ সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করাও সরকারেরই দায়িত্ব।

সরকারী উদ্যোগেই জনগণকে সংগঠিত করে যাবতীয় সমাজ বিরোধী ও অনিষ্টকর কার্যকলাপ বন্ধ করা প্রয়োজন। ওয়াজ ও নসিহত দ্বারা জনমত সৃষ্টি করা যায় না। এটা বিরাট কঠিন কাজ– যা সরকারী ক্ষমতা ও আইনের প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়।